‘কথা কয়েছে’

স্বামী ঋতানন্দ

আমেরিকার বিখ্যাত লেখক ও প্রাচ্যবিদ জোসেফ ক্যাম্পবেল শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে জানিয়েছেন, তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) স্বর্গের অর্গলিত দ্বার উন্মুক্ত করে দিব্যানন্দের প্রস্রবণধারাকে বইয়ে দিয়েছেন।[১] বলা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনার দ্বারা দেবলোকের সঙ্গে মর্তলোকের সেতুবন্ধন করেছিলেন। তিনি স্বর্গকে যেন পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে-ভাবভূমিতে বিচরণ করতেন তাতে জগন্মাতার সঙ্গে তাঁর ভাববিনিময়, কথোপকথন ইত্যাদি হত। ভগবানলাভ বহু সাধকের জীবনে ঘটেছে। তার বর্ণনা কিংবা স্বীকারোক্তি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ইতিবৃত্তে অনেক সময়েই আমরা পড়ে থাকি বা শুনে থাকি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে জগদম্বার সঙ্গে তাঁর ভাবের আদানপ্রদান, কথোপকথন, সংশয় নিরসন ইত্যাদি সত্যিই নিরুপম। এমনটা আর কোনও সাধকের জীবনে ঘটেছে বলে জানা নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ‘‘কথা কয়েছে!—শুধু দর্শন নয়—কথা কয়েছে। বটতলায় দেখলাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে—তারপর কত হাসি! খেলার ছলে আঙ্গুল মটকান হল। তারপর কথা।—কথা কয়েছে!

‘‘তিনদিন ধরে কেঁদেছি, আর বেদ পুরাণ তন্ত্র—এ-সব শাস্ত্রে কি আছে—(তিনি) সব দেখিয়ে দিয়েছেন।’’[২]

যে-যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ, সে-যুগে ধর্মের গ্লানি ছিল তীব্র প্রকটিত। ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে ছিল প্রবল অনাস্থা, অবিশ্বাস, অনীহা এবং সংশয়। ধর্মগ্লানি দূর করে ধর্মপ্রতিষ্ঠার সহায়-রূপে নিজ অভিজ্ঞতাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বোচ্চ কার্যকর বলে মনে করেছিলেন। তাই উপরে উল্লেখিত তাঁর মুখের কথাটির মধ্যে ‘কথা’ এবং ‘কথা কয়েছে’—শব্দ দুটির একাধিকবার উচ্চারণ। এ-উচ্চারণ যেন সমস্ত রকম সংশয়-সন্দেহের প্রতিবাদ ও প্রত্যুত্তর।

মাঝে মাঝেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে ওপারের সঙ্গে এপারের সংযোগ স্থাপন করেছেন। সেসবের যৎকিঞ্চিৎ অনুধ্যানই এ-প্রবন্ধের উপজীব্য।

সন্দেহপ্রবণতা দূর করতে কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ‘‘সত্য সত্যই ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যায় রে, এই যেমন তোতে আমাতে এখন বসে কথা কইচি এইরকম করে তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে

কথা কহা যায়—সত্য বলছি, মাইরি বলছি!"[৩] বলার ভঙ্গিমাটি এমনই অপূর্ব যেন ইয়ার-বন্ধুর সন্দেহভঞ্জন করছেন।

ঈশ্বর আর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন জগতের মানুষ ঈশ্বরের ঐশ্বর্যেই মুগ্ধ। সেই মুগ্ধতাকে পাশ কাটিয়ে স্বয়ং ঈশ্বরের মুখোমুখি হতে মানুষ সহজে চায় না। তিনি বলছেন, ''সব লোক বাবুর বাগান দেখে অবাক্—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি—এই সব দেখেই অবাক্—কিন্তু কই, বাগানের মালিক যে বাবু তাঁকে খোঁজে ক'জন? বাবুকে খোঁজে দু-একজনা।" সেই দু-একজনাকে উৎসাহ দিতেই এরপরই তিনি বললেন, ''ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়; যেমন, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্য বলছি দর্শন হয়!"[৪]

সত্যস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের 'সত্য বলছি' বলা বাহুল্যমাত্র। তা কেবল জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিয়ে আমাদের চক্ষুরুন্মীলন করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন জগন্মাতার হাতের যন্ত্র—জগদম্বার বালক। এ-দুটি ভাব অবলম্বন করে তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা। তাঁর সাধনও জগন্মাতার নির্দেশেই। বেদান্তসাধনের প্রেক্ষাপটটি স্মরণ করা যাক। স্বামী সারদানন্দের বর্ণনা : ''কালীবাটীতে আগমন করিয়া তোতাপুরী প্রথমেই ঘাটের সুবৃহৎ চাঁদনিতে আসিয়া উপস্থিত হন। ঠাকুর তখন তথায় অন্যমনে একপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহার তপোদীপ্ত ভাবোজ্জ্বল বদনের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র শ্রীমৎ তোতা আকৃষ্ট হইলেন এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, ইনি সামান্য পুরুষ নহেন—বেদান্তসাধনের এরূপ উত্তমাধিকারী বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রপ্রাণ বঙ্গে বেদান্তের এরূপ অধিকারী আছে ভাবিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন এবং ঠাকুরকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণপূর্বক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাকে উত্তম অধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি বেদান্তসাধন করিবে?'

''জটাজুটধারী দীর্ঘবপু উলঙ্গ সন্ন্যাসীর ঐ প্রশ্নে ঠাকুর উত্তর করিলেন, 'কি করিব না করিব, আমি কিছুই জানি না—আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে করিব।'

''শ্রীমৎ তোতা—'তবে যাও, তোমার মাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। কারণ আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিব না।'

''ঠাকুর ঐকথায় আর কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে ঁজগদম্বার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার বাণী শুনিতে পাইলেন—'যাও শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আগমন হইয়াছে।' "[৫]

লক্ষণীয়, জগন্মাতার বাণীর মধ্যে—'তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আগমন হইয়াছে'—এই সংবাদটি গুরু ও শিষ্য উভয়ের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। ও-জগৎ থেকে এ-জগতে সংবাদটি এল জগন্মাতার মুখ থেকে।

অলৌকিক ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রুতি বা বেদ। আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেদই প্রমাণ। সাধকের অনুভূতি সত্য কি না, তা যাচাই-এর মাপকাঠি হল শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির সমতা বা একতানতা। বলা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন প্রায় নিরক্ষর। তিনি শাস্ত্রপাঠ করেননি বা শাস্ত্রপাঠ করে সাধনে প্রবৃত্ত হননি। স্বামী বিবেকানন্দের আবিষ্কার—শাস্ত্রের যাথার্থ প্রমাণের জন্য এবারে শ্রীরামকৃষ্ণের নিরক্ষর হয়ে আসা। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে শাস্ত্র বা বেদের স্থানটি দখল করেছিলেন জগন্মাতা। জগন্মাতাই তাঁর কাছে সর্বোচ্চ প্রমাণ।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন বিচার চলছে। নরেন্দ্র শাস্ত্র মানেন না। কিন্তু তিনি বলছেন, ''তা বলে এসব

(শাস্ত্রোক্ত বিষয়) নাই বলছি না। বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে দাও।” তর্ক চলতে থাকে। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ‘‘শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্মার্থ। মর্মার্থটুকু নিতে হয়—যে অর্থটুকু ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখছে, তার মুখের কথা অনেক তফাত। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা; ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মায়ের মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছু লই না।”[৬]

হলধারীর পাণ্ডিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে একবার সন্দেহের উদয় হয় এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শনে ও প্রত্যাদেশ লাভে তা নিরস্ত হয়। স্বামী সারদানন্দ-কৃত বিবরণ :

‘‘বালকস্বভাব ঠাকুর আবার কখনো কখনো হলধারীর পাণ্ডিত্যে ভুলিয়া ইতিকর্তব্যতা বিষয়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতার মতামত গ্রহণ করিতে ছুটিতেন। আমরা শুনিয়াছি, ভাবসহায়ে ঐশ্বরিক স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল অনুভূতি হয় সে-সকলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া এবং ঈশ্বরকে ভাবাভাবের অতীত বলিয়া শাস্ত্রসহায়ে নির্দেশ করিয়া হলধারী ঠাকুরের মনে একদিন বিষম সন্দেহের উদয় করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ‘ভাবিলাম, তবে তো ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখিয়াছি, আদেশ পাইয়াছি, সে সমস্ত ভুল; মা তো তবে আমায় ফাঁকি দিয়াছে! মন বড়ই ব্যাকুল হইল এবং অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিতে লাগিলাম—‘মা, নিরক্ষর মুখ্খু বলে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়?’—সে কান্নার তোড় (বেগ) আর থামে না! কুঠির ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি কি সহসা মেঝে হইতে কুয়াসার মতো ধোঁয়া উঠিয়া সামনের কতকটা স্থান পূর্ণ হইয়া গেল! তারপর দেখি, তাহার ভিতরে আবক্ষলম্বিতশ্মশ্রু একখানি গৌরবর্ণ জীবন্ত সৌম্য মুখ! ঐ মূর্তি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে গম্ভীরস্বরে বলিলেন—‘ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্!’—তিনবার মাত্র ঐ কথাগুলি বলিয়াই ঐ মূর্তি ধীরে ধীরে আবার ওই কুয়াসায় গলিয়া গেল এবং ওই কুয়াসার মতো ধূমও কোথায় অন্তর্হিত হইল! ঐরূপ দেখিয়া সেবার শান্ত হইলাম।’ ঘটনাটি ঠাকুর একদিন স্বামী প্রেমানন্দকে স্বমুখে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ‘হলধারীর কথায় ঐরূপ সন্দেহ আর একবার মনে উঠিয়াছিল; সেবার পূজা করিতে করিতে মাকে ঐ বিষয়ের মীমাংসার জন্য কাঁদিয়া ধরিয়াছিলাম; মা ঐ সময়ে ‘রতির মা’ নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের বেশে ঘটের পার্শ্বে আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন, ‘তুই ভাবমুখে থাক্!’ আবার পরিব্রাজকাচার্য তোতাপুরী গোস্বামী বেদান্তজ্ঞান উপদেশ করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাইবার পর ঠাকুর যখন ছয়মাস কাল ধরিয়া নিরন্তর নির্বিকল্প ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন, তখনো ঐ কালের অন্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার অশরীরী বাণী প্রাণে প্রাণে শুনিতে পাইয়াছিলেন—‘তুই ভাবমুখে থাক্।’ ”[৭]

শাস্ত্রজ্ঞ গুরুরা শিষ্যদের বা ভক্তদের কোনও বিষয় অনুধাবন করানোর জন্য শাস্ত্রবাণী এবং সেইসঙ্গে ভাষ্য, টীকা ইত্যাদি উদ্ধৃত করে বোঝান। সে-পথ শ্রীরামকৃষ্ণ অনুসরণ করেননি। তিনি শাস্ত্রের মর্মার্থ জেনেছিলেন এবং নিজ অনুভবের উপলব্ধি থেকে সত্য বা তত্ত্বকে স্বচ্ছ ও অব্যর্থভাবে ধারণা করাতে পারতেন। পণ্ডিত শাস্ত্রচর্চাকারীরা বিস্ময়ে অভিভূত হতেন এই দেখে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি শাস্ত্রের সঙ্গে অবিকল মিলে যেত। দু-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে। কথাবার্তা চলছে। যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) বললেন, ‘‘নরেন্দ্রের কথা ইনি (ঠাকুর) আর লন না।” ঠাকুর এই কথার অনুমোদনে নরেন্দ্রের চামচিকাকে চাতক বলে ভ্রম করার গল্পটি সকলকে শোনালেন, আর

বললেন, ''সেই থেকে ওর কথা আর লই না।'' আবার বললেন, ''যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে, তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ, ও মনের ভুল। তখন অবাক হয়ে ওকে বললাম, 'কথা কয় যে রে!' নরেন্দ্র বললে, 'ও অমন হয়।' তখন মায়ের কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম। বললাম, 'মা, একি হলো? এসব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে!' তখন দেখিয়ে দিলে, চৈতন্য, অখণ্ড চৈতন্য, চৈতন্যময় রূপ। আর বললে, 'এসব কথা মেলে কেমন করে, যদি মিথ্যা হবে?' তখন বলেছিলাম, 'শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করে দিছলি! তুই আর আসিস নাই'।''[৮]

না এসে নরেনের উপায় আছে! নরেন্দ্রর জন্য দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায়ের প্রাণের ভেতরটা যে গামছা নিঙড়ানোর মতো জোরে মোচড় দেয়! নির্জনে গোপনে নরেনের জন্য কাঁদেন!

পিতার মৃত্যুর পর সাংসারিক বিপর্যয়ে নরেন্দ্রের জীবনের বাহ্য ও অন্তরে এক চূড়ান্ত বোহেমিয়ান ভাবের উদয় হয়। ভক্তেরা উৎসুক হয়ে তাঁকে দেখতে এসে—তিনি নাস্তিক, কুসংসর্গী, পথভ্রষ্ট ইত্যাদি কত বিরুদ্ধ ধারণারই না আভাস দিলেন! সে-সময়ের অবস্থা নরেন্দ্র নিজের মুখে বলেছেন : ''আমাকে তাঁহারা এতদূর হীন ভাবিতে পারেন জানিয়া আমিও দারুণ অভিমানে স্ফীত হইয়া দণ্ড পাইবার ভয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বিষম দুর্বলতা একথা প্রতিপন্নপূর্বক হিউম, বেন, মিল, কোমতে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক সকলের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রচণ্ড তর্ক জুড়িয়া দিলাম। ফলে বুঝিতে পারিলাম, আমার অধঃপতন হইয়াছে, একথায় বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন; বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম এবং ভাবিলাম, ঠাকুরও হয়তো ইঁহাদের মুখে শুনিয়া ঐরূপ বিশ্বাস করিবেন। ঐরূপ ভাবিবামাত্র আবার নিদারুণ অভিমানে অন্তর পূর্ণ হইল। স্থির করিলাম, তা করুন—মানুষের ভাল-মন্দ মতামতের যখন এতই অল্প মূল্য, তখন তাহাতে আসে যায় কি? পরে শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, ঠাকুর তাঁহাদের মুখে ঐ কথা শুনিয়া প্রথমে হাঁ না কিছুই বলেন নাই; পরে ভবনাথ রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে ওই কথা জানাইয়া যখন বলিয়াছিল—'মহাশয়, নরেন্দ্রের এমন হইবে একথা স্বপ্নেরও অগোচর!'—তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'চুপ কর, শালারা! মা বলিয়াছেন, সে কখনো ঐরূপ হইতে পারে না। আর কখনো আমাকে ঐ সকল কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না।' ''[৯]

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে highest authority তাঁর মা জগদম্বা। নরেন সম্পর্কে জগন্মাতার মৌখিক সার্টিফিকেটই যে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে চূড়ান্ত!

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দর্শনাদি বিষয়ে নরেন্দ্রের বিরূপ মন্তব্যের ব্যাপারেও জগন্মাতাকে মধ্যস্থতা করে তাঁর উত্তর পেয়ে তবে শান্ত হতেন। তেমনই এক প্রসঙ্গ:

নরেন্দ্রনাথ হয়তো বলে বসতেন, ''রূপ-টুপ আপনার মাথার খেয়াল!'' নরেন্দ্রের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্ণ অমনি ফাঁপরে পড়ে মা কালীর কাছে নিবেদন করতেন, ''মা, নরেন্দ্র বলে এসব আমার মাথার ভুল। সত্যি কি?'' মা তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলতেন, ''না, ওসব ঠিক, ভুল নয়। নরেন্দ্র ছেলেমানুষ তাই অমন বলে।'' সরল ঠাকুর অমনি আশ্বস্তচিত্তে ফিরে নরেন্দ্রকে শুনিয়ে দিতেন, ''তুই যা খুশি বল না কেন, আমি বিশ্বাস করি না।''[১০]

'আমি বিশ্বাস করি না'—বললে কী হবে, নরেন্দ্র মাঝে মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বাসে যেন টাল ধরিয়ে দিতেন। নরেন্দ্রের উপর তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস অটল হলেও জগদম্বার বালকের কাছে মা-ই authority। তাই সে-অবস্থায় তিনি নরেন্দ্রের

কথাকে যেন খানিকটা বিশ্বাস ও মান্য করেও শুদ্ধ মনের খুঁতখুঁতানি মেটাতে মাকেই সাক্ষী মানতেন। সেসময় তাঁর কাছে জগন্মাতাই সন্দেহভঞ্জনকারিণী, মুশকিল আসান। এরকম এক ঘটনা :

শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম স্নেহের উপরেও নরেন্দ্রনাথ নিঃসংকোচে তীক্ষ্ণ সমালোচনার তীর নিক্ষেপ করতেন। নরেন্দ্রের বোধগম্য হত না—পরমহংসদেব তাঁর জন্য কেন এত ভাবিত হন। আবার ঠাকুরের এই অন্তহীন ভালবাসার কারণে ঠাকুর যে অপরের কাছে হেয় হতে পারেন, সে-দুশ্চিন্তাও নরেন্দ্রনাথের ছিল। সেজন্য তিনি ঠাকুরকে সচেতন করতে কখনও কখনও কঠোর শাসন করতেও ছাড়তেন না। একদিন ঠাকুরকে বলেই বসলেন, ‘‘আপনার শেষকালে না ভরত [জড়ভরত] রাজার অবস্থা হয়।’’ ভরতরাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন বলে পরজন্মে হরিণজন্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। বালকস্বভাব সরলচিত্ত ঠাকুর ওই কথা শুনে যারপরনাই চিন্তিত হলেন এবং বললেন, ‘‘ঠিক বলেছিস। তাইতো রে, তাহলে কি হবে? আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি না!’’ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ঠাকুর দারুণ বিমর্ষ হয়ে জগদম্বাকে ওই কথার সালিশি মেনে বসলেন ও কিছুক্ষণ পরে হাসতে হাসতে ফিরে এসে বললেন, ‘‘যা শালা, আমি তোর কথা শুনব না, মা বললেন, ‘তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই ভালবাসিস। যেদিন ওর ভেতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি না’।’’[১১] আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নারায়ণহীন নরেন্দ্রনাথের কোনও প্রয়োজন নেই। নারায়ণ-রূপ নরেন্দ্রনাথেই তাঁর আগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এ-সত্যটির আবিষ্কার জগন্মাতার। ঠাকুরের সর্বভূতে ‘নারায়ণ’ জ্ঞান এমনই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল যে, তাঁর নিজের কাছে পর্যন্ত তা অজানা ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলেছেন, ‘‘He lived an unconscious life’’—নিজের সম্পর্কে তিনি এক অসচেতন জীবন যাপন করেছেন।

ঈশ্বরীয় ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণ কোনওমতেই নিম্নস্তরে থেকে তৃপ্তিবোধ করতেন না। আরও এগিয়ে আরও এগিয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরের আনন্দ ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাইতেন এবং অপরকেও সেদিকে প্রণোদিত করতেন। ১৪ জুলাই ১৮৮৫, ছোট নরেনের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বলছেন, ‘‘শুধু ঈশ্বর আছেন, বোধে বোধ করলে কি হবে? ঈশ্বরদর্শন হলেই যে সব হয়ে গেল, তা নয়।

‘‘তাঁকে ঘরে আনতে হয়—আলাপ করতে হয়।

‘‘কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে।

‘‘রাজাকে কেউ কেউ দেখেছে। কিন্তু দু-একজন বাড়িতে আনতে পারে, আর খাওয়াতে-দাওয়াতে পারে।’’[১২]

৯ আগস্ট ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণকে খোলসা করেই বললেন, ‘‘আপনাকে অনেকদিন বলবার ইচ্ছা ছিল পারি নাই—আজ বলতে ইচ্ছা হচ্ছে।

‘‘আমার যা অবস্থা—আপনি বলেন, সাধন করলেই ওরকম হয়, তা নয়। এতে (আমাতে) কিছু বিশেষ আছে।’’[১৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অন্যতম বিশেষ হল, ঈশ্বরকে নানাভাবে সম্ভোগ করা। ঈশ্বরের দর্শন-স্পর্শন, তাঁর সঙ্গে কথন-বলন, চলন ইত্যাদি নানাপ্রকারে তাঁতে নিমজ্জিত থেকে তাঁর রসাস্বাদন করা। ঈশ্বরের সঙ্গে এহেন অন্তরঙ্গ-বিলাস জগতের ধর্মেতিহাসে বিরল।

আবার শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ‘‘কিরূপ লোক (ভক্ত) এখানে আসবে, আসবার আগে দেখিয়ে দেয়।’’[১৪] তাঁর মানসপুত্র রাখালের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)

আসার কথা জগন্মাতা তাঁকে আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ''রাখাল আসার কয়েকদিন আগে দেখছি, মা একটি বালককে সহসা আমার ক্রোড়ে বসিয়ে দিয়ে বলছেন, 'এইটি তোমার পুত্র।' শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠে বললাম, 'সে কি?—আমার আবার ছেলে?' তিনি তাতে হেসে বুঝিয়ে দিলেন, 'সাধারণ সংসারিভাবে ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র।' তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরে রাখাল এসে উপস্থিত হল এবং বুঝলাম—এই সেই বালক।''[১৫]

অন্যদের আগমনের প্রতীক্ষায় শ্রীরামকৃষ্ণ কীরকম ব্যাকুল হয়েছিলেন এবং কীভাবে তাঁরা পরে তাঁর কাছে এসেছিলেন, সে-প্রসঙ্গে তাঁর নিজের কথা : ''তোদের সব দেখবার জন্য প্রাণের ভিতরটা তখন এমন করে উঠত, এমনভাবে মোচড় দিত যে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়তুম! ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হতো! লোকের সামনে, কি মনে করবে ভেবে, কাঁদতে পারতুম না; কোন রকমে সামলে-সুমলে থাকতুম! আর যখন দিন গিয়ে রাত আসত, মার ঘরে, বিষ্ণুঘরে আরতির বাজনা বেজে উঠত, তখন আরও একটা দিন গেল—তোরা এখনও এলিনি ভেবে আর সামলাতে পারতুম না; কুঠির উপরের ছাদে উঠে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস আয়রে', বলে চেঁচিয়ে ডাকতুম ও ডাক ছেড়ে কাঁদতুম। মনে হতো পাগল হয়ে যাব! তারপর কিছুদিন বাদে তোরা সব একে একে আসতে আরম্ভ করলি—তখন ঠাণ্ডা হই! আর আগে দেখেছিলাম বলে তোরা যেমন যেমন আসতে লাগলি অমনি চিনতে পারলুম! তারপর পূর্ণ যখন এল, তখন মা বললে, 'ঐ পূর্ণতে তুই যারা সব আসবে বলে দেখেছিলি তাদের আসা পূর্ণ হলো। ঐ থাকের (শ্রেণীর) লোকের কেউ আসতে আর বাকি রইল না।' মা দেখিয়ে বলে দিলে, 'এরাই সব তোর অন্তরঙ্গ'।''[১৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ কারও ঐহিক বিষয়প্রাপ্তির অনুরোধে জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করতে পারতেন না। কিন্তু আধ্যাত্মিক আবদার ফেলতে পারতেন না। এমনই একটি ঘটনা লীলাপ্রসঙ্গকারের লেখনীতে:

শ্রীযুত বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) ইচ্ছা হইল, তাঁহার ভাবসমাধি হউক। ঠাকুরকে যাইয়া কান্নাকাটি করিয়া বিশেষভাবে ধরিলেন—''আপনি করে দিন।'' ঠাকুর তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, ''আচ্ছা, মাকে বলব; আমার ইচ্ছাতে কি হয় রে?''—ইত্যাদি। কিন্তু ঠাকুরের সে-কথা কে শোনে? বাবুরামের ঐ এক কথা—'আপনি করে দিন।' এইরূপ আবদারের কয়েকদিন পরেই শ্রীযুত বাবুরামকে কার্যবশতঃ নিজেদের বাটী আঁটপুরে যাইতে হইল। সেটা ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। এদিকে ঠাকুর তো ভাবিয়া আকুল—কি করিয়া বাবুরামের ভাবসমাধি হইবে! একে বলেন, ওকে বলেন, ''বাবুরাম ঢের করে কাঁদাকাটা করে গেছে যেন তার ভাব হয়—কি হবে? যদি না হয়, তবে সে আর এখানকার (আমার) কথা মানবেনি।'' তারপর মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) বলিলেন, ''মা, বাবুরামের যাতে একটু ভাবটাব হয়, তাই করে দে।'' মা বলিলেন, ''ওর ভাব হবে না; ওর জ্ঞান হবে।'' ঠাকুরের শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐ বাণী শুনিয়া আবার ভাবনা। আমাদের কাহারও কাহারও কাছে বলিলেনও—''তাইতো বাবুরামের কথা মাকে বললুম, তা মা বললে, 'ওর ভাব হবেনি, ওর জ্ঞান হবে'; তা যাই হোক, একটা কিছু হয়ে তার মনে শান্তি হলেই হলো; তার জন্যে মনটা কেমন করচে—অনেক কাঁদাকাটা করে গেছে''—ইত্যাদি। আহা, সে কতই ভাবনা, যাহাতে বাবুরামের কোনরূপে সাক্ষাৎ ধর্মোপলব্ধি হয়! আবার সেই ভাবনার কথা বলিবার সময় ঠাকুরের কেমন বলা—''এটা না হলে ও (বাবুরাম) আর মানবেনি।''—যেন তাহার

মানা-না-মানার উপর ঠাকুরের সকলই নির্ভর করিতেছে!’[১৭]

উল্লেখ করা যেতে পারে, যে-প্রেমানন্দের ভিতর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমের দিকটি বিশেষ প্রকটিত হয়েছিল এবং যাঁর প্রেমস্বরূপিণী রাধারানির অংশে জন্ম, তাঁর ক্ষেত্রে ভাব-ভক্তি লাভই আপাতদৃষ্টে আকাঙ্ক্ষিত, সেক্ষেত্রে জগদম্বার কথা—‘ওর ভাব হবে না; ওর জ্ঞান হবে’, এ যেন মায়ের এক অভিনব আবিষ্কার!

জগন্মাতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের এইরকম যে-অন্তরঙ্গ আলাপ, কথাবার্তা, ভাববিনিময়, সন্দেহ-নিরসন ইত্যাদি, তার জন্য যে-অপরিসীম মূল্য ঠাকুর দিয়েছিলেন, সে-কথা অন্তরঙ্গদের কাছে তাঁদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে বলতেন। সেরকমই একটি বিবৃতি :

‘‘আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে সাধারণ জীবের শরীর-মনে ঐরূপ [দিব্যোন্মাদ অবস্থা] হওয়া দূরে থাকুক উহার একচতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীর ত্যাগ হয়। দিবা-রাত্রির অধিকাংশ ভাগ মার কোন না কোনরূপ দর্শনাদি পাইয়া ভুলিয়া থাকিতাম তাই রক্ষা, নতুবা (নিজ শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা থাকা অসম্ভব হইত। এখন হইতে আরম্ভ হইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, সময়ে সময়ে চেষ্টা করিয়াও পলক ফেলিতে পারিতাম না! কত কাল গত হইল, তাহার জ্ঞান থাকিত না এবং শরীর বাঁচাইয়া চলিতে হইবে, একথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শরীরের দিকে যখন একটু আধটু দৃষ্টি পড়িত, তখন উহার অবস্থা দেখিয়া বিষম ভয় হইত; ভাবিতাম, পাগল হইতে বসিয়াছি নাকি? দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চক্ষে অঙ্গুলি প্রদানপূর্বক দেখিতাম, চক্ষুর পলক উহাতেও পড়ে কিনা। তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশূন্য হইয়া থাকিত। ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতাম এবং মাকে বলিতাম, ‘‘মা, তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করার কি এই ফল হলো? শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি?’’ আবার পরক্ষণেই বলিতাম, ‘‘তা যা হবার হকগে, শরীর যায় যাক, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িসনি, আমায় দেখা দে, কৃপা কর, আমি যে মা তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি একেবারেই নাই।’’ ঐরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে মন আবার অদ্ভুত উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া মনে হইত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইতাম!’’[১৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ নিঃশেষে জগন্মাতার উপর নির্ভর করেছেন। তাঁর যখন যা প্রয়োজন হয়েছে, কিংবা যখনই মনে কোনও জিজ্ঞাসা এসেছে তার জন্য তিনি সর্বৈব নির্ভরশীল ছিলেন মায়ের উপর। তাই দেখা গেছে, মা তাঁকে রাশ ঠেলে দিয়েছেন, বাগ্‌বাদিনীর এক-একটি কিরণ এসে তাঁর হৃদয়কে আলোকিত করেছে। সেজন্য তাঁকে কোনওকিছুই শাস্ত্রপাঠ করে জানার চেষ্টা করতে হয়নি। আর তার ফলস্বরূপ তাঁর জীবনে সকল অভীষ্টই দ্রুত সফল হয়েছে। তাঁর কাছে কোনওকিছু জানার উপায় হল—মাকে ব্যাকুল হয়ে জানানো ও প্রার্থনা করা; কারণ সে-সময় তাঁর কাছে সেটিই যেন জীবন-মরণ সমস্যা এবং সেজন্য তাঁর বিকল্পহীন একমাত্র আশ্রয় জগদম্বা স্বয়ং। তাঁর মান-অভিমান, আবদার, দাবি, ক্ষোভ সবই মায়ের কাছে। ঠাকুরের কথায় :

‘‘হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম! মাকে বললাম, আমি মুখ্যু—তুমি আমায় জানিয়ে দাও—বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে—নানা শাস্ত্রে—কী আছে। মা বললেন, বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা বেদে আছে, তাঁকে তন্ত্রে বলে, সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ—আবার তাঁকেই পুরাণে বলে, সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ।’’[১৯]

‘‘শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥’’

বেদান্তের অদ্বৈতমতের সিদ্ধান্তটি ব্যক্ত হয়েছে শ্লোকটিতে। অদ্বৈতমতে, ব্রহ্ম নিরুপাধিক অর্থাৎ নির্গুণ এবং নামরূপবর্জিত অর্থাৎ নিরাকার। ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা উপহিত হলে তাঁকে বলা হয় সগুণ-সাকার ঈশ্বর। তাঁর শক্তি জগদম্বা। এ-সমস্তই অদ্বৈতমতে নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মে কল্পিত বা অধ্যস্ত। এসবের ব্রহ্ম-অতিরিক্ত সত্তা নেই। তাই, এটি খুবই অভিনব যে, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের পারিভাষিক সীমা অতিক্রম করে যুক্তিতর্কের কূটকচালি পরিহার করে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সর্বাধার জগদম্বা—যাঁর অস্তিত্বই কিনা অদ্বৈতমতে অস্বীকৃত, তিনিই আবার ঠাকুরকে স্বমুখে জানিয়েছেন, 'বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' সিদ্ধান্তটি। এযুগে জগদম্বার স্বীকারোক্তি বেদান্ত-সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য এবং আচার্যদের একক মত প্রতিষ্ঠার নিরঙ্কুশ দাবিকে নস্যাৎ করে সর্বমত ও পথের আধার বা আশ্রয়ই যে শ্রীরামকৃষ্ণের জগদম্বা, তারই দিগ্‌নির্দেশ করছে।

অনেক সময়ই শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতির প্রকাশ তথাকথিত বিভিন্ন মতবাদের রূপরেখার সংকীর্ণ গণ্ডিকে ছাপিয়ে চরম সত্য বা তত্ত্বকে প্রকাশ করেছে। তিনি বলতেন, ''(নিজের শরীরটি দেখিয়ে) এর মধ্যে দুটি আছে—এক মা আর অপরটি ভক্ত।'' মা বা জগন্মাতা ভাবটি কখনও কখনও তাঁর ভাষায় কট্টর শাস্ত্রীয় সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে সর্বাত্মক হয়ে উঠত। ৭ মার্চ ১৮৮৫ শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ''এখানে অপর লোক কেউ নাই। সেদিন—হরিশ কাছে ছিল—দেখলাম—খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার! তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ওই সব কথা বলছি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম—তখন দেখি আপনি বলছে, শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।''[২০]

এখানেও উল্লেখ্য যে, 'সচ্চিদানন্দ' শব্দটি ব্যবহারের ফলে জ্ঞান-ভক্তি, সগুণ-নির্গুণ, দ্বৈত-অদ্বৈত ইত্যাদি আপাতবিরুদ্ধ ভাবগুলি একাকার হয়ে গেছে। কারণ, 'সচ্চিদানন্দ' শব্দটি ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণাত্মক। 'বাইরে আসা', 'বলা', 'অবতার', 'শক্তির আরাধনা' ইত্যাদি পরিভাষাগুলি সবই ব্রহ্ম আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণত পরিহরণীয়। কিন্তু ব্যতিক্রমী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সর্ব মত-পথের সত্যতা স্বীকার ও সমন্বয়ে অবশ্যই যুক্তিপূর্ণ এবং দর্শনের কালে শ্রীরামকৃষ্ণকে নির্দেশ করে বলায় তা নিঃসন্দেহে অবিসংবাদী ও সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে।

বেদান্তসাধনের পরাকাষ্ঠা নির্বিকল্প সমাধি লাভের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের মন সমস্তপ্রকার সংকল্প-বিকল্পশূন্য হওয়ার পথে একমাত্র অন্তরায় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর এতদিনের প্রিয় 'জগন্মাতা'। তাঁকেও গুরু তোতাপুরীর নির্দেশে জ্ঞান-অসি দিয়ে ছিন্ন করতেই শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ়। এরপর ছয় মাস তিনি সে-অবস্থায় ছিলেন। জগন্মাতা অনুভব করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধি তাঁর নিজের জন্য নয়, জগৎকল্যাণের জন্য। তাই জগন্মাতা তাঁকে তিনবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, ''তুই ভাবমুখে থাক্।'' অর্থাৎ, ভাবস্থ না থেকে ভাবমুখে থাকতে। 'ভাবমুখে থাকা'র অর্থ হল, নির্গুণ-নিরাকার অদ্বয়ভূমি আর সগুণ-সাকার দ্বৈতভূমির মিলনস্থল। যেখান থেকে সব ভাবের উৎপত্তি—সেখানে অবস্থান। যেখানে স্থিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বয়ভূমির অনুভব ইচ্ছামাত্রে লাভ করতে পারবেন এবং জগৎকল্যাণে মনকে সেই মেলভূমিতে রেখে জগতের মানুষের সঙ্গে সেই ভাবের আদান-প্রদান করতেও সক্ষম হবেন। 'ভাবমুখে' থাকার নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের পরবর্তী প্রায় সমস্ত জীবনটিই অতিবাহিত হয়েছিল 'ভাবমুখে' থেকে। কখনও

কখনও সেকথা ভুলে স্বভাবসুলভ আগ্রহে তিনি ভাবস্থ হয়ে যেতেন এবং এভাবে কখনও তাঁর হাত ভেঙেছে, কখনও দাঁত ভেঙেছে। পরে তিনি স্বীকার করেছেন, অন্তরঙ্গদের সঙ্গে নরলীলায় না থেকে ভাবস্থ হওয়ার ফলেই তাঁর ওরকম দশা হয়েছিল। যা হোক, সহজ কথায় বলা চলে, অদ্বৈতবুদ্ধিতে স্থিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ‘ভক্তি-ভক্ত’ নিয়ে ছিলেন।

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে। অন্ত্যলীলাকাল। তিনি অসুস্থ শুনে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে তাঁকে একদিন দেখতে যান। তর্কচূড়ামণি কথায় কথায় তাঁকে বলেন, ‘‘মহাশয়, শাস্ত্রে পড়েছি আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক রোগ আরাম করে ফেলতে পারেন। আরাম হোক মনে করে মন একাগ্র করে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ঐরূপ করলে হয় না?” অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, ‘‘তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বল্লে গো? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙ্গা হাড়-মাসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?” একথা শুনে শশধর নিরুত্তর হন।

পণ্ডিত চলে যাওয়ার পর নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে ওইরকম করার জন্য একেবারে বিশেষভাবে ধরে বসলেন। বললেন, ‘‘আপনাকে অসুখ সারাতেই হবে, আমাদের জন্য সারাতে হবে।” শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ‘‘আমার কি ইচ্ছা রে যে, আমি রোগে ভুগি; আমি তো মনে করি সারুক, কিন্তু সারে কৈ? সারা, না সারা, মা-র হাত।” নরেন্দ্রনাথ : ‘‘তবে মাকে বলুন সারিয়ে দিতে, তিনি আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন।” শ্রীরামকৃষ্ণ : ‘‘তোরা তো বলছিস, কিন্তু ও-কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না রে।” নরেন্দ্রনাথ—‘‘তা হবে না মশাই, আপনাকে বলতেই হবে। আমাদের জন্য বলতে হবে।” শ্রীরামকৃষ্ণ : ‘‘আচ্ছা, দেখি, পারি তো বলবো।”

কয়েকঘণ্টা পরে নরেন্দ্রনাথ আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘‘মশায়, বলেছিলেন? মা কি বল্লেন?”

শ্রীরামকৃষ্ণ—‘‘মাকে বললুম, এইটের দরুণ কিছু খেতে পারি না; যাতে দুটি খেতে পারি করে দে। তা মা বল্লেন—তোদের সকলকে দেখিয়ে—‘কেন? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস্।’ আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না।”[২১]

এখানে লক্ষণীয় যে, শশধর তর্কচূড়ামণিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তজ্ঞান দিয়ে নিজেই নিরস্ত করেছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রতি অপ্রতিহত প্রেম তাঁর শারীরিক কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চিরস্বভাব বিরুদ্ধ রোগ সারানো ইত্যাদির জন্য মাকে বলার মতো কঠিনতর কাজটি করতে উদ্যত করেছিল। কিন্তু মা বেদান্তের চরমতম জ্ঞানটি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিরোধ করলেন! জগন্মাতাকে অস্বীকার করে নির্বিকল্প অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করার পর সর্বভূতে একাত্মতা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ব্যষ্টিশরীরে মনকে সীমায়িত করার প্রগলভতা শ্রীরামকৃষ্ণকে লজ্জিত করেছিল।

বেদপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়। তা মুনিঋষিদের হৃদয়ে অতীন্দ্রিয় অলৌকিক সত্যের উদ্ভাস। তা থেকেই বেদ-বেদান্ত। এই মূল থেকেই কালে কালে ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনী, বাদ-মতবাদ। শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর-মন যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে জগন্মাতার আশ্রয়স্থল—কর্মক্ষেত্র। নিজের ব্যক্তিসত্তাকে যতদূর সম্ভব লুপ্ত করে জগন্মাতার যন্ত্র হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পুরুষকে আশ্রয় করে কর্ম ব্যাপ্ত হলেও বস্তুত জগন্মাতা-শ্রীরামকৃষ্ণ এক এবং অভিন্ন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাকে অপৌরুষেয় বললে তা অতিরঞ্জন হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন জগন্মাতার

ভাব ও কার্য প্রকাশের সেতুমাত্র ।

অনাগত ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও আদর্শ নিয়ে কত ভাষ্য, টীকাই না রচনা হবে! লিখিত হবে শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন। গড়ে উঠবে শ্রীরামকৃষ্ণ-মতবাদ। নিঃসন্দেহে সেগুলি একদিন মানুষকে আলোড়িত করবে। আর তার সঙ্গে সেগুলির ভিত্তিরূপে স্বীকৃত হবে জগন্মাতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সরাসরি কথোপকথন, আলাপ ইত্যাদি। জগন্মাতার কাছ থেকে পাওয়া ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ব্রহ্ম-শক্তির অভেদত্ব, সর্ব মত-পথের সত্যতা ইত্যাদির বীজ এবং পূর্ব পূর্ব আচার্যদের একদেশদর্শিতা পরিহারের দিঙ্‌নির্দেশ। জগন্মাতা-প্রোথিত সেই বীজই মহীরুহ-স্বরূপ প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে। সেখানে বাদ-মতবাদের আপাত ভিন্নতা সরিয়ে রেখে প্রত্যেকটি ভাবাদর্শের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে শ্রদ্ধার আসন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের উদ্‌গাতা মূলত জগন্মাতার প্রতিফলন শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ জগন্মাতা।

তথ্যসূত্র

১। Ed. & Translated by Swami Chetanananda, *Ramakrishna as We Saw Him* (Advaita Ashrama : Kolkata, 1999), mentioned in the Back Cover

২। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), অখণ্ড, পৃঃ ৮৯৪ [এরপর, *কথামৃত*]

৩। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০), ভাগ ১, গুরুভাগ—পূর্বার্ধ, পৃঃ ৪৮-৪৯ [এরপর, *লীলাপ্রসঙ্গ*]

৪। দ্রঃ *কথামৃত*, পৃঃ ৬৫৯

৫। *লীলাপ্রসঙ্গ*, ভাগ ১, সাধকভাব, পৃঃ ১৬৪

৬। দ্রঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), খণ্ড ১, পৃঃ ১০৭-০৮

৭। *লীলাপ্রসঙ্গ*, ভাগ ১, সাধকভাব, পৃঃ ৮৭-৮৮

৮। দ্রঃ *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ১, পৃঃ ১০৭

৯। তদেব, পৃঃ ১২৮

১০। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৯৬-৯৭

১১। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৯৫-৯৬

১২। *কথামৃত*, পৃঃ ৮৬২

১৩। তদেব, পৃঃ ৮৯৪

১৪। তদেব

১৫। দ্রঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা*, (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৫), অখণ্ড, পৃঃ ৬৩

১৬। *লীলাপ্রসঙ্গ*, ভাগ ২, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ১০৫

১৭। তদেব, পৃঃ ১১২

১৮। তদেব, ভাগ ১, সাধকভাব, পৃঃ ১০২-০৩

১৯। স্বামী চেতনানন্দ, *ধ্যানলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ*, (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৬) পৃঃ ২২৪-২৫

২০। *কথামৃত*, পৃঃ ৭৬২

২১। দ্রঃ স্বামী প্রভানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা*, (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৭), ভাগ ২, পৃঃ ২৮-২৯